উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই সূচক কেবলমাত্র উন্নয়নের উপায় বা মাধ্যমের উপর জোর দেয়নি, উন্নয়নের শেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে। এখানেই সূচকটির উৎকর্ষ ও স্বকীয়তা।

☐ মানব উন্নয়ন সূচক গঠন করার পদ্ধতি ঃ একটি উদাহরণ (Method of Construction of Human Development Index : An Example)

আমরা জানি যে, মানব উন্নয়ন সূচক হল তিনটি উপ-সূচকের সরল যৌগিক গড়। এই তিনটি উপ-সূচক হল প্রত্যাশিত আয়ু সূচক (Life Expectancy Index), শিক্ষা সূচক (Education Index) এবং স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক (Gross Domestic Product Index)। এই তিনটি উপ-সূচক কীভাবে গঠন করা যায় তা দেখা যাক।

এই তিনটি উপ-সূচকের প্রতিটি গঠন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই মানগুলি নিম্নরূপ ঃ

নির্দেশকসমূহ (Indicators)	**সর্বনিম্ন মান** (Minimum value)	**সর্বোচ্চ মান** (Maximum value)
জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু	25 বছর	85 বছর
প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার	0%	100%
সম্মিলিত ভর্তির হার	0%	100%
মাথাপিছু স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (মার্কিন ডলারে আন্তর্জাতিক ক্রয় ক্ষমতার সমতার নিরিখে)	$100	$40,000

HDI-এর কোন উপসূচকের মান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট নির্দেশকের মান নিম্নলিখিত সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

$$\text{উপ-সূচক} = \frac{\text{প্রকৃত মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}}{\text{সর্বোচ্চ মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}}$$

উদাহরণস্বরূপ, কোন দেশে যদি জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু 55 বছর হয় তাহলে ঐ দেশের প্রত্যাশিত

$$\text{আয়ু সূচক} = \frac{55-25}{85-25} = \frac{30}{60} = 0.50$$

এই সূচক থেকে জানা যাবে সম্ভাব্য সর্বাধিক সাফল্যের কতটা সংশ্লিষ্ট দেশটি অর্জন করতে পেরেছে।

আয় সূচক গঠন করার পদ্ধতিটি অবশ্য কিছুটা ভিন্ন এবং জটিল। 1994 সালে বিশ্বের গড় আয় ছিল 5835 ডলার (PPP $)। এই আয়স্তরকে ভিত্তি আয়স্তর (threshold level) ধরে এই স্তরের চেয়ে বাড়তি আয়কে Atkinson-এর সূত্র প্রয়োগ করে বাট্টা করা হয়েছে। এর যুক্তি হল, ঐ নির্ধারিত সীমার (threshold level) উপরে আয়স্তর যত বেশি হবে, সেই অতিরিক্ত আয়স্তরের উপযোগিতা ক্রমাগত কম হবে। Atkinson-এর সূত্র প্রয়োগ করে $40,000 (PPP$) এই সর্বাধিক আয়ের বাট্টাকৃত মান হল $6,154 (PPP$)। আয়সূচক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা আয়ের সর্বাধিক মান বলতে এই বাট্টাকৃত মানটিকেই গ্রহণ করবো।

আমরা নীচে HDI গঠন করার পদ্ধতির একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা দুটি দেশ নিয়েছি ঃ গ্রিস ও গ্যাবন। প্রথমটি শিল্পোন্নত দেশ ; দ্বিতীয়টি উন্নয়নশীল দেশ। HDI নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে দুটি দেশের তথ্য নীচে দেওয়া হল।

দেশ	আয়ু প্রত্যাশা (বছরে)	বয়স্ক সাক্ষরতার হার (%)	সম্মিলিত ভর্তির হার (%)	মাথাপিছু প্রকৃত GDP (PPP $)
গ্রিস	77.8	96.7	82	11,265
গ্যাবন	54.1	62.6	60	3,641

প্রত্যাশিত আয়ু সূচক ঃ

গ্রিস ঃ $\frac{77.8-25}{85-25}=\frac{52.8}{60}=0.880$

গ্যাবন ঃ $\frac{54.1-25}{85-25}=\frac{29.1}{60}=0.485$

বয়স্ক সাক্ষরতার সূচক ঃ

গ্রিস ঃ $\frac{96.7-0}{100-0}=\frac{96.7}{100}=0.967$

গ্যাবন ঃ $\frac{62.6-0}{100-0}=\frac{62.6}{100}=0.626$

সম্মিলিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরে মোট ভর্তির সূচক ঃ

গ্রিস ঃ $\frac{82-0}{100-0}=\frac{82}{100}=0.820$

গ্যাবন ঃ $\frac{60-0}{100-0}=\frac{60}{100}=0.600$

শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক

গ্রিস ঃ $(2 \times 0.967 + 1 \times 0.820) \div 3 = 2.754 \div 3 = 0.918$

গ্যাবন ঃ $(2 \times 0.625 + 1 \times 0.600) \div 3 = 1.850 \div 3 = 0.617$

সংশোধিত মাথাপিছু প্রকৃত GDP (PPP $) সূচক

গ্রিসের মাথাপিছু প্রকৃত GDP হল $11,265 (PPP$)। এটি নির্ধারিত ভিত্তিসীমার ($6154) চেয়ে বেশি। সুতরাং, গ্রিসের আয়ের বাট্টা করতে হবে। Atkinson-এর সূত্র বসিয়ে গ্রিসের বাট্টাকৃত মাথাপিছু প্রকৃত GDP দাঁড়ায় $ 5,982 (PPP $)। গ্যাবনের মাথাপিছু প্রকৃত GDP নির্ধারিত ভিত্তিসীমার চেয়ে কম। সুতরাং এক্ষেত্রে আয়ের কোন সংশোধনের (adjustment) প্রয়োজন নেই। তাহলে ঐ দুই দেশের প্রকৃত মাথাপিছু GDP সূচক নিম্নরূপ ঃ

গ্রিস ঃ $\frac{5,982-100}{6,154-100}=\frac{5,882}{6,054}=0.972$

গ্যাবন ঃ $\frac{3,641-100}{6,154-100}=\frac{3,541}{6,054}=0.584$

HDI হল প্রত্যাশিত আয়ু সূচক, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক এবং সংশোধিত মাথাপিছু প্রকৃত GDP সূচকের সরল যৌগিক গড়। সুতরাং, ঐ তিনটি সূচকের যোগফলকে 3 দ্বারা ভাগ করলেই ঐ দুটি দেশের HDI পাওয়া যাবে।

দেশ	প্রত্যাশিত আয়ু সূচক	শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক	সংশোধিত মাথাপিছু প্রকৃত GDP (PPP $) সূচক	তিনটি সূচকের যোগফল	HDI (= তিনটি সূচকের যোগফল ÷ 3)
গ্রিস	0.880	0.918	0.972	2.770	0.923
গ্যাবন	0.485	0.617	0.584	1.686	0.562

সূত্র ঃ UNDP, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, 1997, পৃঃ 122

1.3. অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত অর্থনীতির সংজ্ঞা (Definition of an Underdeveloped Economy) :

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সাধারণভাবে অনুন্নত অর্থনীতির বর্ণনায় বলা হয় যে, এটি এরূপ একটি দেশ যার মাথাপিছু আয় স্বল্প এবং এই আয়ের স্বল্পতার পিছনে কারণ হল দেশটির উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহারের অভাব। মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা অবশ্য লক্ষণমাত্র। আসল বিষয় হ'ল, উন্নয়নের ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার এবং এর ফলেই মাথাপিছু আয় কম। সাধারণভাবে বলা যায়, **স্বল্পোন্নত দেশ হ'ল সেই দেশ যার বর্তমান মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় যথেষ্ট কম এবং ফলে জীবনযাত্রার মান খুব নিম্ন কিন্তু যার অর্থনৈতিক উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।** সাধারণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মাপকাঠি ধরে, যে সকল দেশের মাথাপিছু আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয়ের এক-চতুর্থাংশেরও কম তাদের স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত অর্থনীতি বা দেশ বলা হয়। Jacob Viner বলেছেন যে, **অনুন্নত দেশ হল সেই দেশ যার আরও মূলধন বা আরও শ্রম বা আরও প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা এর সবগুলোই ব্যবহার করে এর বর্তমান জনসংখ্যার জন্য উচ্চতর জীবনযাত্রার মান অর্জনের যথেষ্ট ক্ষমতা বা সম্ভাবনা রয়েছে।** (An underdeveloped country is one which has good potential or prospects for using more capital, or more labour, or more available natural resources, or all of these to support its present population on a higher level of living).

ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের মতে, "যে সব দেশে অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত মানবিক সম্পদের সহাবস্থান দেখা যায় তাদের অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল অনুন্নত দেশে মূলধনের স্বল্পতা দেখা যায়। মূলধনের অভাবের জন্যই ঐ সমস্ত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রম সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ফলে মাথাপিছু উৎপাদন কম হয় এবং শ্রমের বেকারত্ব দেখা দেয়। সেই সঙ্গে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদও লক্ষ করা যায়। তাই অনেকের মতে, যে সমস্ত অর্থনীতিতে অব্যবহৃত শ্রম সম্পদ, অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মূলধনের স্বল্পতা রয়েছে, সে সমস্ত অর্থনীতিকেই স্বল্পোন্নত অর্থনীতি বা অনুন্নত অর্থনীতি বলা যেতে পারে। জাতিপুঞ্জের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর লোকেদের মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের তুলনায় যে সব দেশের লোকেদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম, সেই দেশগুলোকেই স্বল্পোন্নত দেশ বলা হয়। এম. ই. স্ট্যালি অনুন্নত দেশের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, যে দেশে গণ দারিদ্র্য প্রকটভাবে স্থায়ী, যা সাময়িক কোনো বিপর্যয়ের ফলে ঘটেনি, যেখানে অপ্রচলিত ও সাবেকি উৎপাদন পদ্ধতি ও সমাজ সংগঠন দারিদ্র্যের অস্তিত্বকে আরও স্থিতিশীল করেছে কিন্তু যেখানে পরীক্ষিতভাবে সফল পদ্ধতির দ্বারা দারিদ্র্য প্রশমিত করা যায়, সেই দেশকেই অনুন্নত দেশ বলা যায়।

এই সমস্ত সংজ্ঞা হতে স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত অর্থনীতির **তিনটি মৌল লক্ষণের** উল্লেখ করা যেতে পারেঃ **(ক) মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, (খ) দারিদ্র্য বা জীবনযাত্রার নিম্ন মান এবং (গ) উন্নয়নের সম্ভাবনা।** পাশাপাশি, স্বল্পোন্নত অর্থনীতির এই সমস্ত সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে আমরা স্বল্পোন্নত অর্থনীতি সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্যও করতে পারি।

প্রথমত, আমরা জানি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান মানদণ্ড হল দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি। এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার হল প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ব্যবধান। অনেক দেশেই দেখা যাবে যে, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বিশেষ বাড়ছে না অথবা বাড়লেও তা খুব ধীর গতিতে বাড়ছে। বলতে গেলে, এ সমস্ত দেশগুলো যেন একটা অনড়, অচল অবস্থার মধ্যে রয়েছে (stagnating)। আমাদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির উপরোক্ত সূত্র হতে আমরা এই সমস্ত দেশের এই প্রায় নিশ্চল অবস্থার দু'টি প্রধান কারণ নির্দেশ করতে পারি। হয় এই সমস্ত দেশে জমি কিংবা শ্রম কিংবা উভয়েরই উৎপাদনশীলতা খুব কম অথবা / এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি। ফলে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বিশেষ বাড়ছে না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও মনে রাখা দরকার। কোন বিশেষ সময়কালে কোন স্বল্পোন্নত দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার কোন উন্নত দেশের ঐ হারের চেয়ে বেশি হতে পারে। বিশেষত অনুন্নত দেশটির ভিত্তি বৎসরের আয়ের কম মানের দরুন এরূপ ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং, প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হারকেই উন্নয়নের মাপকাঠি বলে ধরলে চলবে না। উন্নতির বা অনুন্নতির স্তর সম্পর্কে জানতে হলে বর্তমান জীবনযাত্রার মানের স্তর বা বর্তমান মাথাপিছু আয়স্তরকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। সুতরাং, উন্নতি বা অনুন্নতি হল একটি আপেক্ষিক বা তুলনামূলক ধারণা। আমরা উন্নয়নের একটা মইয়ের কথা কল্পনা করতে পারি। কিছু দেশ এই মইয়ের অনেক উপরে উঠে গেছে ; কিছু দেশ মইয়ের মাঝামাঝি উচ্চতায় অবস্থান করছে ও আরো উপরে ওঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর কিছু দেশ অসহায়ভাবে মইয়ের নীচের দিকে পড়ে আছে।

অনুন্নতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করার সময় আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশ বলতে কখনোই আমরা এটা বোঝাচ্ছি না যে, দেশটির উন্নয়নের কোনো সম্ভাবনাই নেই বা অচল, অনড় অবস্থাই এর ভবিষ্যৎ বিধিলিপি (forever doomed to stagnation)। আসলে দেশটির সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ঘটে নি, আর তাই এর মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম। জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ক্ষমতা দেশটির আছে। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল উপাদানগুলোও দেশটির আছে। কিন্তু উপযুক্ত উদ্যোগের অভাবে সেগুলোর সদ্ব্যবহার ঘটেনি। উন্নয়নের এই উপাদানগুলোর সদ্ব্যবহার ঘটলেই দেশটি অনুন্নতির কানাগলি হতে উন্নতির রাজপথে এসে পৌঁছবে এবং উন্নতির দিকে যাত্রা শুরু হবে।

তাহলে আমরা বিশ্বের দেশগুলোকে মোটের উপর দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। কিছু দেশ রয়েছে যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ঘটিয়েছে। তাদের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। এগুলো হল উন্নত দেশ। এরা উচ্চ মাথাপিছু আয় ভোগ করছে। অন্যদিকে রয়েছে বহু দেশ যারা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারে নি। এরা অনুন্নত দেশ। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে এই শ্রেণিবিভাগ সাধারণত মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে করা হয়। অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদই কেবলমাত্র প্রকৃত আয় বৃদ্ধিকে উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি বলে মানতে নারাজ। যেমন, অধ্যাপক টোডারো অনুন্নতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, শুধু বস্তুগত বিচারে স্থূল জাতীয় উৎপাদন বা মাথাপিছু উৎপাদন বাড়লেই তাকে অর্থনৈতিক উন্নতি বলা ঠিক হবে না। যদি দেখা যায় যে, জাতীয় বা মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্য, আয় বৈষম্য ও বেকারত্ব কমছে, তবেই অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে বলা যাবে। একথা স্বীকার্য যে, উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তবু এখনও পর্যন্ত এটাই উন্নয়নের সূচক বা মাপকাঠি হিসাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ এবং সংগঠন উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয়কেই ব্যবহার করে থাকে বা থাকেন। এটা অবশ্য কখনও কখনও ভুল সিদ্ধান্ত দিতে পারে। যেমন, মাথাপিছু আয়কে উন্নয়নের মাপকাঠি ধরলে কুয়েতকে উন্নত দেশ বলতে হয় যা আদৌ সত্য নয়। রাষ্ট্র সংঘ অথবা বিশ্ব ব্যাঙ্ক অবশ্য এই সমস্ত দেশকে 'তেল রপ্তানিকারী দেশ' বলে উল্লেখ করেছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণিতে ভাগ করা আদৌ সন্তোষজনক নয়। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, যে সমস্ত দেশ তাদের উৎপাদন ক্ষমতা সদ্ব্যবহারের বাধাগুলি দূর করতে সক্ষম হয়েছে এবং উচ্চ মাথাপিছু আয় অর্জনের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে, সেই সমস্ত দেশই উন্নত দেশ। অন্যদিকে, যে সমস্ত দেশ উন্নয়নের বাধাগুলোকে দূর করে তাদের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে নি এবং তার ফলে তাদের মাথাপিছু আয় নিম্নস্তরে রয়ে গেছে, সেই দেশগুলোই অনুন্নত দেশ। এভাবে, কোন্ দেশ উন্নয়নের বাধা কতটা দূর করতে পেরেছে, সেটিও উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করলে উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে পার্থক্য বিচার করা আরও অর্থবহ হবে বলে মনে হয়।

1.4. অনুন্নতির বৈশিষ্ট্য

(Characteristics of Underdevelopment) :

স্বল্পোন্নত অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এরূপ অর্থনীতির কয়েকটি মৌল বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। বিভিন্ন স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের স্তরও সমান নয়। অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা, পেরু ও চিলি, মিশর ও বাংলাদেশ—এরা কখনোই এক রকমের নয়। স্বভাবতই কোনো একটা বিশেষ সংজ্ঞা দিয়ে সমস্ত স্বল্পোন্নত অর্থনীতির প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। তবুও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর **কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য** লক্ষ করা যায়। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

1. কম মাথাপিছু আয় ঃ স্বল্পোন্নত দেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় খুবই কম। এরূপ দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনগুলো অদক্ষ ও অনুন্নত। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও দুর্বল। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশে উন্নত কারিগরি জ্ঞানের অভাব। ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ কম। জনসংখ্যার তুলনায় জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ কম বলে মাথাপিছু আয় খুবই কম। জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন করে। জনসাধারণের আয় কম বলে জীবনযাত্রার মানও খুব নিম্ন। তারা নানা অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে এবং দেশের জনসাধারণের প্রত্যাশিত গড় আয়ু খুবই কম হয়।

2. কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ঃ স্বল্পোন্নত অর্থনীতি একান্তরূপে কৃষিনির্ভর। এরূপ অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ কৃষি থেকে উদ্ভূত হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে নিযুক্ত। জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক বা তার বেশি আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। কিন্তু স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হ'লেও কৃষিব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। কৃষির উৎপাদন কৌশল সাবেকি ও প্রাচীন ধরনের। ফলে শ্রমিক পিছু বা একর পিছু উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। এখানে চাষিরা মূলত নিজেদের পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষিকার্য ক'রে থাকে। বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন করে না বললেই চলে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক কৃষি প্রসার লাভ করে নি। এখানে চাষবাসের উদ্দেশ্য হ'ল পরিবারের ভরণপোষণ (subsistence farming)।

স্বল্পোন্নত দেশে কৃষির এত বেশি গুরুত্বের পিছনে মূলতঃ দু'টি বিষয় কাজ করে। **প্রথমত,** কৃষিকার্যে সাধারণ শিক্ষা বা কারিগরি জ্ঞান কোনোটারই বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাই স্বল্পোন্নত দেশে অশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানবর্জিত জনসাধারণের পক্ষে কৃষিই হ'ল উপযুক্ত জীবিকা। **দ্বিতীয়ত,** স্বল্পোন্নত দেশের জনসাধারণের একটা বড় অংশই দরিদ্র ও সঙ্গতিহীন। এরূপ লোকেদের কাছে কৃষিই একমাত্র উপযুক্ত পেশা, কারণ সাবেকি কৃষি ব্যবস্থায় একসঙ্গে খুব বেশি মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। এ সমস্ত কারণেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কৃষির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

3. মূলধন স্বল্পতা ঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মূলধনের বড়ই অভাব। মূলধনের স্বল্পতা এ সমস্ত দেশে একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল। নার্কসের মতে, মূলধনের স্বল্পতার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে **'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র'** কাজ করে। স্বল্পোন্নত দেশে মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় কম। সঞ্চয় কম বলে মূলধন গঠনের হারও কম হয়। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম। আর উৎপাদনশীলতা কম বলে আয় কম। এভাবে মূলধনের যোগানের দিক থেকে একটা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। আবার, মূলধনের চাহিদার দিক থেকেও অনুরূপ একটি দুষ্টচক্র কাজ করে। অনুন্নত দেশে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম বলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কম। ফলে দেশীয় বাজার খুব একটা বড় নয়। এজন্য বিনিয়োগকারীরা খুব বেশি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। এর ফলেও মূলধন গঠনের হার কম হয় ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম থাকে। ফলে শ্রমিকের আয় কম। এভাবে মূলধনের অভাব স্বল্পোন্নত দেশকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ রাখে।

4. শিল্পে অনগ্রসরতা ঃ স্বল্পোন্নত দেশ সাধারণভাবে শিল্পে অনগ্রসর। এরূপ দেশে অধিকাংশ শিল্পই হ'ল ভোগ্যপণ্য শিল্প। এসব শিল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষিজ কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। মূলধনী দ্রব্য শিল্প গড়ে

না ওঠায় স্বল্পোন্নত দেশে মূল ও ভারী শিল্প তেমন গড়ে ওঠে নি। মূলধনী দ্রব্য শিল্প গড়ে না ওঠায় স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পের বনিয়াদ খুব দৃঢ় নয়। প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয় এবং লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলতা দেখা দেয়।

5. জনসংখ্যার চাপ ঃ অধিকাংশ স্বল্পোন্নত অর্থনীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ। এরূপ অর্থনীতিতে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে, জাতীয় আয় সেই হারে বাড়ে না। ফলে মাথাপিছু আয় খুব ধীর গতিতে বাড়ে। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হবার সাথে সাথেই মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায়। কিন্তু জন্মহার মোটামুটি একই থাকে। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। দ্রুত হারে জনসংখ্যার ভোগব্যয় মেটানোর জন্য উৎপাদনের একটি বড় অংশই ব্যয় করতে হয়। ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন খুব কম হয়। এভাবে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

6. বেকারত্ব ঃ স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশি। অথচ বিনিয়োগের হার খুবই কম। এ সমস্ত দেশে শিল্প তেমন প্রসার লাভ করে নি। তাই শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে স্বল্পোন্নত দেশে দেখা দেয় গণ-বেকারত্ব। শিল্পে নিয়োগের সুযোগ কম হওয়ায় বর্ধিত জনসংখ্যা কৃষিতে ভিড় করে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের কৃষিপদ্ধতি চিরাচরিত ও সাবেকি ধরনের। সারা বছর কৃষিকার্য চলে না, বছরের কয়েকটি ঋতুতে কৃষিকার্যে ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়। ফলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা কৃষিক্ষেত্রে এসে ভিড় করলে কৃষিতে দেখা দেয় অর্ধ-বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। এই অর্ধ-বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের সঙ্গে উন্মুক্ত বেকারত্ব যুক্ত হয়ে স্বল্পোন্নত দেশে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে।

7. ঔপনিবেশিক বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলো প্রধানত কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করে। এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যকে ঔপনিবেশিক বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রটিই প্রধান ক্ষেত্র। এই অর্থনীতির রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাধান্য বেশি থাকে। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে শিল্পের খুব বেশি বিকাশ ঘটে নি। ফলে ঐ অর্থনীতি বিদেশ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। এরূপ ক্ষেত্রে বাণিজ্য হারও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিপক্ষে যায়। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিজ কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য কম দামে রপ্তানি করে, বিনিময়ে অধিক দাম দিয়ে শিল্পজাত দ্রব্য কেনে। ফলে এই দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রায়ই ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

8. নিম্ন মানের মানবিক মূলধন ঃ স্বল্পোন্নত দেশের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল মানবিক মূলধনের নিম্ন মান। স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ নিরক্ষর। ফলে তাদের কাজকর্মে ও চিন্তাভাবনায় প্রগতিশীলতার অভাব। নানা কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতায় তাদের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন। শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের খুবই অভাব। এ সমস্ত কারণে শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। তাছাড়া, ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী এরূপ উদ্যোক্তারও অভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া, নানারকম কুসংস্কারের ফলে শ্রম ও মূলধনের চলনশীলতা খুব কম থাকে। এ সমস্ত কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যার গুণগত মান খুবই নিম্নে থাকে।

9. দ্বৈত অর্থনীতি ঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে একটি দ্বৈত অর্থনীতি লক্ষ করা যায়। অর্থনীতিটি যেন দু'টি ক্ষেত্রে বিভক্ত। একটি উন্নত ক্ষেত্র এবং অপরটি অনুন্নত ক্ষেত্র। উন্নত ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে আধুনিক কলাকৌশল গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে, অনুন্নত ক্ষেত্রটিতে উৎপাদন কৌশল প্রাচীন ও সাবেকি ধরনের। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে এই দু'টি ক্ষেত্র দু'টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো সহাবস্থান করে। একটি ক্ষেত্র অপর ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না অর্থাৎ উন্নয়নের সুফল উন্নত ক্ষেত্র থেকে অনুন্নত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে না। আবার, অনুন্নত ক্ষেত্রও উন্নত ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না। দু'টি ভিন্ন ধরনের অর্থনীতি যেন পাশাপাশি বিরাজ করে। একেই দ্বৈত অর্থনীতি বলে।

10. আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য ঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দেখা যায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতেই অধিক আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। মোট জনসংখ্যার একটা নগণ্য অংশের আয় ও সম্পদ বেশি। কিন্তু

Acc No - 330| Eco | 51.2

জনসংখ্যার বিশাল অংশ গণ-দারিদ্র্য ও গণ-বেকারত্বের মধ্যে দিন কাটায়। আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

11. প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্প বা অপূর্ণ ব্যবহার। অর্থনৈতিক অনুন্নতির এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ। প্রায় সবস্তু স্বল্পোন্নত দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদকে ঠিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা নেই। প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করতে না পারার জন্যই অনেক দেশ অনুন্নত রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত থাকার পিছনে দু'টি প্রধান কারণ রয়েছে। **প্রথমত,** প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে সেই মূলধনের অভাব লক্ষ করা যায়। মূলধনের অভাবের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। **দ্বিতীয়ত,** প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহারের কারণ হ'ল উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানের অভাব। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে কারিগরি জ্ঞান প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে সেই কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে অনেক স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত রয়েছে এবং সেজন্যই ঐ সব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না।

12. অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ উপরের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কিছু অন-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। এগুলো হ'ল ঃ (i) নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা, (ii) পরিবর্তনবিমুখ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ কাঠামো, (iii) শিশু শ্রমিকের আধিক্য, (iv) সমাজে নারীদের নীচু স্থান ও অপুষ্টি, (v) উচ্চ শিশু মৃত্যুর হার, (vi) জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার অভাব, (vii) অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন প্রভৃতি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অনুন্নতিকে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চেনা যায়। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি যে সকল প্রধান বিষয়ের উপর আলোকপাত করে সেগুলো হ'ল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, বাজারের অসম্পূর্ণতা এবং অর্থনীতিটির দ্বৈতাবস্থা। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো একই সঙ্গে ঐ দেশে বিদ্যমান অনুন্নতির কারণ ও ফল উভয়ই। অনুন্নতির কারণগুলোকে (causes) তাদের ফল (effects) হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না কারণ তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

1.4.1. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র (Vicious Circle of Poverty) ঃ

Ragnar Nurkse তাঁর সুবিখ্যাত "Problems of Capital Formation" গ্রন্থে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেন। স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশে অনুন্নতির স্থায়িত্ব (persistence) ব্যাখ্যা করতে নার্কস এই ধারণাটির অবতারণা করেন। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটির মূল কথা হ'ল ঃ **একটি দেশ দরিদ্র কারণ তার মূলধন কম, আর মূলধন কম কারণ দেশটি দরিদ্র।** (A country is poor because it has little capital, and it cannot raise capital because it is poor)। সেজন্য অনেক সময় হাল্কাভাবে ধারণাটিকে এরূপভাবে ব্যক্ত করা হয় ঃ একটি দেশ দরিদ্র কারণ সে দরিদ্র। (A country is poor as it is poor)। নার্কসের মতে, অনুন্নত দেশে একটি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে এবং এই দুষ্টচক্রই দেশটিকে দরিদ্র বা অনুন্নত করে রাখে অর্থাৎ যেন বলা হচ্ছে, দারিদ্র্যই দারিদ্র্যের কারণ। তাই 'দুষ্টচক্র' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

চিত্র ঃ 1.1

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি দুটি চিত্রের (চিত্র 1.1 ও চিত্র 1.2) সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। নার্কসের মতে, মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের যোগান উভয় দিক হতেই একটি চক্রাকার বা বৃত্তাকার শক্তি কাজ করে। মূলধনের চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হতেই দুষ্টচক্রের ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। মূলধনের যোগানের (চিত্র 1.1) দিক থেকে দেখতে গেলে, অনুন্নত দেশে

মূলধনের যোগান কম কারণ সঞ্চয় কম। আর সঞ্চয় কম কারণ আয় কম। আয় কম হবার কারণ হ'ল কম উৎপাদনশীলতা। কম উৎপাদনশীলতার কারণ হল শ্রমিকের মাথাপিছু মূলধন কম। আর মাথাপিছু মূলধন কম হবার কারণ হ'ল মূলধনের কম যোগান। এভাবে মূলধনের যোগানের দিক হতে বৃত্তটি সম্পূর্ণ। বৃত্তটির পরিধির দুই প্রান্তবিন্দু একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। অধ্যাপক Hicks মন্তব্য করেছেনঃ "The snake eats its own tail".

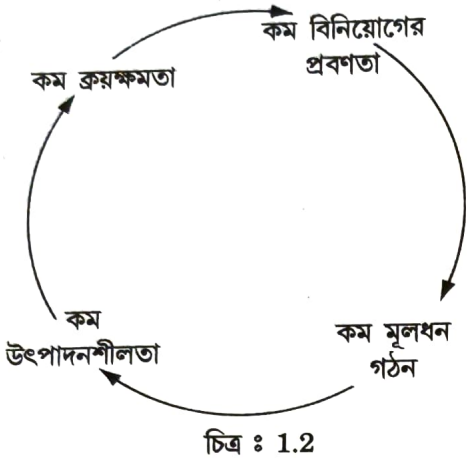

চিত্র ঃ 1.2

মূলধনের চাহিদার দিক হতেও বৃত্তটি সম্পূর্ণ (চিত্র 1.2)। অনুন্নত দেশে মূলধনের চাহিদা কম কারণ এখানে উৎপাদকদের বিনিয়োগ করার প্রবণতা কম। আর বিনিয়োগ প্রবণতা কম কারণ অভ্যন্তরীণ বাজার সংকীর্ণ। দ্রব্যসামগ্রীর বাজার বা চাহিদা নেই কারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা কম। আর লোকের ক্রয়ক্ষমতা কম কারণ তাদের উৎপাদনশীলতা কম। উৎপাদনশীলতা কম হবার কারণ হ'ল শ্রমিকপিছু মূলধনের ব্যবহার বা চাহিদা কম। এভাবে মূলধনের চাহিদার দিক হতেও বৃত্তটি সম্পূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। অনুন্নত দেশে মূলধনের চাহিদা কম, এই কথাটি আপাতবিরোধী মনে হতে পারে। আমরা জানি, অনুন্নত দেশে মূলধনের অভাব অর্থাৎ এখানে মূলধনের যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি। কিন্তু নার্কসের যুক্তি হল, অনুন্নত দেশে লোকের ক্রয়ক্ষমতা কম। ফলে এখানে অভ্যন্তরীণ বাজার সীমিত। ফলে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রবণতা কম কারণ তাদের বিনিয়োগ করার ইচ্ছা বাজারের আয়তন বা বিস্তৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই এরূপ দেশে মূলধনের যোগান যেমন কম, চাহিদাও কম। উভয় কারণেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ।

এভাবে, নার্কসের ভাষায়, **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হল এমন কতকগুলো শক্তির একত্র সমাবেশ যারা একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দরিদ্র দেশকে দারিদ্র্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখে** (A vicious circle of poverty is the circular constellation of forces tending to act and react upon one another so as to keep a poor country in a state of poverty)।

বাজারের অপূর্ণতা
↑ ↓
অনুন্নত প্রাকৃতিক সম্পদ
↑ ↓
পশ্চাদ্‌গামী মনোভাব

অধ্যাপক Meier এবং অধ্যাপক Baldwin দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটিকে আরও একভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে, বাজারের অপূর্ণতা, অনুন্নত প্রাকৃতিক সম্পদ ও দেশের জনসাধারণের পশ্চাদ্‌গামী মনোভাব একটি দেশকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের আবর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। পাশের ছকের সাহায্যে আমরা এটি দেখিয়েছি। এই তিনটি বিষয় একে অপরকে পুষ্ট করে। এর ফলে একটি দরিদ্র দেশ দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকে থাকে।

☐ কীভাবে এই দুষ্টচক্র ভাঙা যাবে ? (How to break this Vicious Circle ?)

এখন প্রশ্ন হ'ল, কীভাবে এই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙা যাবে ? অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলকথা হল এই দুষ্টচক্রকে কোনো না কোনো বিন্দুতে ছেদ করা। নার্কস মনে করেন যে, এই দুষ্টচক্রকে ভাঙা সম্ভব। তাঁর মতে, এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে বাজার প্রসারিত করতে হবে। তাহলে প্রশ্ন হ'ল, একটি অনুন্নত দেশের বাজার কীভাবে প্রসারিত করা যাবে ? যেহেতু একটি স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বিদেশের বাজার দখল করা খুবই কঠিন, তাই অভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত করতে হবে। এজন্য অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। নার্কসের মতে, এর জন্য প্রয়োজন দেশটির সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো। শুধুমাত্র একটি শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ালে ঐ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় বাড়বে এবং ঐ শিল্পের উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু ঐ বর্ধিত উৎপাদনের সবটাই বিক্রি হবে না কারণ কেবলমাত্র ঐ শিল্পে নিযুক্ত লোকেদের আয় বেড়েছে। তারা তাদের বর্ধিত আয়ের সবটাই ঐ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যে ব্যয় করবে না। ফলে দেখা দেবে অতিরিক্ত